শতবর্ষের আলোয় নরেশ গুহ :
কাব্যে পত্রে দিনলিপিতে

শুভাশিস চক্রবর্তী

গান্ধীজির সঙ্গে

গঙ্গার তীর ঘেঁষে পথ। নম্র পদচারণায় হেঁটে চলেছেন মহাত্মা গান্ধী। তাঁর এক হাত কবি অমিয় চক্রবর্তীর কাঁধে, অন্য হাতটি নিজের কাঁধে নিয়েছেন কবি নরেশ গুহ। তিনি অবশ্য তখন দৈনিক 'যুগান্তর'-এর সাংবাদিক। পাশাপাশি বিদেশি কোয়েকার গোষ্ঠীর হয়ে ত্রাণকার্যের স্বেচ্ছাসেবক। ১৯৪৭-এর ৩০ এপ্রিল। দাঙ্গাবিধ্বস্ত বিহারে ত্রাণ বিষয়ে আলাপ চলছিল পাটনা শহরে এই তিনজনের পদক্ষেপে। গান্ধীজির পরামর্শ মন দিয়ে শুনছেন দুই প্রজন্মের বাংলা কবিতার দুই বিখ্যাত প্রতিনিধি। নরেশ তাঁর 'দাঙ্গার পরেকার দিনলিপি'তে লিখেছেন: ''উঠোনের পথ দিয়ে বেড়াতে-বেড়াতে তিনি কতো কথাই বললেন। আশি বছরের কোনো উদ্ধত রেখাই দেহে নেই। কালকে যেন অতিক্রম ক'রেছেন তিনি তাঁর মন দিয়ে, জীবনের শক্তি দিয়ে।"

ঠিক আশি বছর আগে বঙ্গ জুড়ে নেমে এসেছিল করাল দুর্ভিক্ষ। 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'। গ্রাম উজাড় করে শহর কলকাতায় এসেছে নিরন্ন মানুষ। ভাত নয়, চাইছে ফ্যান। নগরবাসীর দোরে দোরে কঙ্কালসার সন্তান কোলে নিয়ে ক্ষুধার্ত মা! এদের মুখে অন্ন তুলে দিতে কোয়েকার গোষ্ঠীর সদস্য নরেশ দিন রাত্রি পরিশ্রম করেছেন; লঙ্গরখানার স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে তাঁর মানবিক ভূমিকার কথা খুব বেশি জানা যায় না। আত্মপ্রচারের আজকের অসভ্যতা তখন বিরল। নরেশ গুহ এই বিষয়ে নিজের ভূমিকার কথা আড়ালে রেখেছেন সযত্নে। ডায়েরি লিখতেন নিয়মিত। এখনও পর্যন্ত অপ্রকাশিত মোট আটটি ডায়েরির পাতায় খুঁজে পাওয়া যায় এই ভিন্ন মানুষটিকে, যিনি শুধু কবি নন, মানবিক সত্তায় উজ্জ্বল এক পরিশ্রমী দেশসেবক।

রবীন্দ্রতীর্থ

'ক্যামেরা হাতে সব জায়গায় ঘুরে বেড়াও বুঝি?' — প্রশ্নটা করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সকালেই তিনি শুনেছিলেন কলকাতা থেকে একটি কলেজ ছাত্র শান্তিনিকেতন আশ্রমে পায়ে হেঁটে এসেছে। তীর্থ ভ্রমণে পুণ্য অর্জনের শ্রেষ্ঠ পন্থা পদব্রজে গমন — এই ঋষিবাক্য মান্য করে রিপন কলেজের ছাত্র নরেশ

গুহ এমন আশ্চর্য কাণ্ডের নায়ক হয়ে উঠেছিলেন সেদিন। সংবাদটি ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগেনি। রবীন্দ্রনাথও জানতে পেরেছেন যথাসময়ে। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাস। গুরুদেব তখন বেশ অসুস্থ। দর্শনার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাতে বেশ কড়াকড়ি তখন। কবি নিজেও সেই নিয়ম ভাঙেন না। সতেরো বছরের নরেশ বুঝে গেলেন এই যাত্রায় ঈশ্বর-দর্শন অসম্ভব।

সেদিন বিকেলে উদীচী বাড়ির দোতলায় কবি তখন আরাম কেদারায় আসীন। বাড়িটি কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। নরেশ দেখতে পেলেন তারই এক জায়গায় একটি সুড়ঙ্গের মত গর্ত। কুকুরদের তৈরি বিশেষ পথ। সেই পথে নরেশ ঢুকে গেলেন। সোজা তাঁর স্বপ্নের মহামানবের কাছে। খুব ইচ্ছে — সদ্য কেনা বেবি ব্রাউনি ক্যামেরায় গুরুদেবের একটি ছবি তোলা। সে কথা জানাতে রবীন্দ্রনাথ ওই প্রশ্নটি করেন। মুখে মৃদু প্রশ্রয়ের হাসি নিয়ে কবি বললেন : 'আচ্ছা কালকে এসো। সকালে কলকাতা যাচ্ছি। ট্রেনের সময় জেনে নিয়ে আগেই চলে এসো।'

এর অনেক পরে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে নরেশ গুহর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। তাঁর 'শান্তিনিকেতনে ছুটি' কবিতাটি পাঠক মহলে আদৃত হয়েছিল :

'শান্তিনিকেতনে বৃষ্টি: ছুটি শেষ/ ভিজে আলতা-লাল
শূন্য পথ/ ডাকঘরে বিমুখ কাউন্টার চুপ/ কাল
হয়তো রোদ্দুর হবে, শুকোবে খোয়াই, ভিজে ঘাস...'।

কবির 'দুরন্ত দুপুর' কাব্যগ্রন্থের উজ্জ্বল কবিতাগুলির অন্যতম এটি। বইটি দিলীপ কুমার গুপ্ত তাঁর সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশ করেছিলেন। সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের করা অনন্য প্রচ্ছদ। সেই কবিতার বইয়ের সব থেকে বিখ্যাত কবিতাটির কিছু পংক্তি আজকের তরুণ-তরুণীরাও তাদের বিরহ উদযাপনে সযত্নে উচ্চারণ করে : 'এক বর্ষার বৃষ্টিতে যদি মুছে যায় নাম / এত পথ হেঁটে এত জল ঘেঁটে কি তবে পেলাম!'

অশোক-মিত্র নরেশ

> ''এ-ছ'বছরে দেখা যাচ্ছে তাহলে আর বদলাইনি। সময়-কাটানোর মহদুদ্দেশ্যে সে-সময় টিকটিকিগিন্নিকে পাহারা দিতুম, নন্দ নিবাসের এই একতলার ঘরেও আপাতত সারাদিন পড়ে পড়ে তা-ই করি।''

একটি চিঠিতে লিখছেন অশোক মিত্র। সুদূর 'লঙ্কা' থেকে! কাশীর একটা ডাকঘরের নাম লঙ্কা। নন্দ নিবাসের চার নং ঘরের বাসিন্দা তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ছাত্র তখন। পত্রপ্রাপক অভিন্নহৃদয় নরেশ গুহ উত্তরে জানতে চাইলে অশোক জানালেন, ''নন্দ নিবাস আর কিছুই নয়, বড়ো বড়ো হোস্টেল পূর্ণ হয়ে যাবার পর তবু-আসতে-থাকা ছেলেদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শহরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে কতগুলো হোস্টেলের মতো খোলা হয়, তাদেরই একটি।''

দুটো চিঠিই ১৯৪৯-এর জানুয়ারি মাসে লেখা। প্রথমটা চারে, আর দ্বিতীয়টা চোদ্দ তারিখে। এত ঘন ঘন? তাহলে জেনে রাখা ভাল, জানুয়ারির পয়লা থেকে একটানা দু' মাস তাঁরা পরস্পরকে চিঠি লিখেছেন। এক-আধটা পোস্টকার্ডে হতে পারে, দু'-একদিন বাদ যায়নি এমনও নয়, তবে অধিকাংশ চিঠিই দীর্ঘ এবং দুই নব্য যুবার ব্যক্তিগত আন্তরিক কথনে ভরপুর।

'টিকটিকিগিন্নিকে পাহারা' দেবার প্রসঙ্গটিতে অশোক মিত্রের বালক বয়সের একটি কবিতা লেখার ঘটনা জড়িয়ে আছে। বাধ্য হয়ে কাশীবাস, ইংরেজি-নিতে-নিতে অর্থনীতি নিয়ে ফেলা অশোক মিত্রের আর ভাল লাগছিল না। ঘরটাতে হাওয়া-বাতাসের প্রবেশ নিষেধ — ''বারাণসীর পুণ্যতীর্থে প্রাত্যহিক স্বতোধারায় বয়ে যায় না, কোদাল-কুড়ুল দিয়ে খাল কেটে তাকে বওয়াতে হয়।'' এমন ভাবে জীবন কাটছে তাঁর। সেই সূত্রে বালক বয়সে লেখা একটি গদ্য-কবিতাকে মনে পড়ছে : কবিতা-লেখককে প্রত্যহ বিকেলে কেন বাসায় পাওয়া যেত সে-সময়, তারই এক অপরূপ বিবৃতি —

''আমার ঘরের দেয়ালে
শ্রীযুক্তা টিকটিকি অন্তঃসত্ত্বা।
মাতৃত্বের টলোমলো গৌরবের উপর
যাতে নারীধর্ষণের সকলঙ্ক ইতিহাস
সাংবাদিক প্রোজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত না-হয়
সেজন্যে পাহারায় আছি।''

নরেশ গুহর স্বলিখিত তালিকায় দেখা যাচ্ছে, অশোক মিত্রের লেখা অজস্র চিঠির মধ্যে ৬৭টি চিঠি তিনি রক্ষা করতে পেরেছিলেন অথবা প্রকাশযোগ্য মনে করেছিলেন। প্রায় সব কটি চিঠিই নরেশ প্রকাশ করার ইচ্ছেয় নিজের হাতে পুনর্লিখন করেছিলেন, ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে। কোনওটার টীকাও করে রেখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তার থেকে গুটিকয় আমাদের 'অহর্নিশ' পত্রিকায় ছাপা সম্ভব হয়েছিল। তবে সব কটি চিঠি তন্ন-তন্ন করে পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, কেননা পত্রিকা প্রকাশের দিন পর্যন্ত সে-সব চিঠি নাড়াচাড়া করার সুযোগ আমি হাতছাড়া করিনি।

অনেক চিঠিতেই অশোক মিত্র কবিতা সংযুক্ত করে দিতেন। কখনও আবার শুধুই কবিতা পাঠাতেন। যেমন ১৯৪৯-এর ছাব্বিশে আগস্ট বা উনিশে অক্টোবরে চিঠি নেই, শুধুই কবিতা। দ্বিতীয়টির কয়েক পংক্তি : ''আর সকলের মতো, / এটা আমিও ভালো করেই জানি / সে-মেয়ের জীবন আমার জীবনের সঙ্গে যুক্ত হবে না। /...যে-মেয়েকে ভালোবাসলুম / অথচ যে-মেয়ের ভালোবাসা পেলুম না, /...তবু সে-মেয়েকেই, / সে-করুণ-মুহূর্তকেই ভালোবাসা। / জানি এর পর মৃত্যু।'' গোটা কবিতাটা সম্পর্কে নরেশ গুহর মন্তব্য : ''কবি হিশেবে অশোক কেন আমার প্রিয়, বোধ করি, এই কবিতাটা তার প্রমাণ।''

মেয়েটি কে? দুই বন্ধুই এব্যাপারে নিশ্চুপ। দশ বছর আগে মুখোমুখি নরেশ গুহ এবং আমি। জানতে চাইলাম। মৃদু হেসে এড়িয়ে গেলেন। মনে হল অন্য কোনও চিঠিতে লুকিয়ে আছে কাঙ্খিত নাম। তবে কি জানুয়ারির দু' তারিখে লেখা চিঠিটাই এর উত্তর? সেখানে আছে : ''ঢাকাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বছরে আমার এক সহপাঠিনী জুটলেন, অসম্ভব ক্ষীণাঙ্গিণী, অসম্ভব পড়ুয়া।...জীবন যখন শুকায়ে যায় তিনি বুঝি করুণাধারায়ই এসে থাকেন! এখন বলুন তো আমি কী করি? কী করি! কী করি! তবে কি গলায় দড়ি?'' তবে এগারো দিন পরে লেখা আরেকটা চিঠির সঙ্গে যুক্ত আছে 'ঋণশোধ' নামের কবিতা : ''মূর্খ! মূর্খ! / আত্মার আত্মীয়তাই প্রেম। / কোনো পুরুষ আত্মার সমকক্ষতায় ভেসে বেড়াতে পারে / এমন মেয়ে কোথায়?''

এই ভিন্ন সুর আরও স্পষ্ট হয় আর একটি চিঠিতে : ''প্রেমের চেয়ে অনেক ভালো প্রেমের কবিতা। আসলে 'সক্রিয়ভাবে' প্রেমে পড়লে প্রেমের কবিতা অন্তত লেখা অসম্ভব। হৃদয়ের সমস্ত তন্নিষ্ঠা তখন

তো প্রেমকে জড়িয়ে আবেশঅবশ, কবিতা লেখার সময় কোথায়, সচেতনতা কোথায়?" তবে ১৯৫১-র ১৪ নভেম্বরের চিঠিটি অত্যন্ত রহস্যময়। সেখানে এক, দুই, তিন করে মোট পাঁচটি পয়েন্টে পাঁচ জন মেয়ের কথা আছে, যেন একটা উত্তরপত্র, যেন যাঁদের নিয়ে আপনি 'সন্দেহ' করছেন তাঁরা পাঁচ জন হলেন এমন : ''আর বেশিদিন কুমারী ভূষিতা থাকবেন না তিনি। আজ কলকাতা রওনা হয়ে গেলেন, আগামী ২১ নভেম্বর আপনাদের পাড়ার হরিসাধন দাশগুপ্তকে তিনি হিন্দুমতে বরণ করছেন।" কিংবা ''কুমারী কাঞ্চনলতা সাবরওয়ালকে কোনো দিন চোখেই দেখিনি।" এই সমস্ত রহস্যের যবনিকা পড়ে গেল ব্যাঙ্কক শহর থেকে পাঠানো ১৯৫৬-র আঠাশে এপ্রিলের চিঠিতে। বৈশাখ মাসে নরেশ গুহর বিবাহ জেনে নিজের আনন্দ ও অভিনন্দন জানিয়ে অশোক লিখলেন : ''আমিও বিবাহ করছি। সব কিছু শেষ হয়ে গেছে বলেই; স্মৃতিকে, রক্তকে অন্ধকার আগুনে ডুবিয়ে পুড়িয়ে মারতে চাই বলে। অসম্ভব দুরাশা। তবু, সব আশা শেষ হয়ে গেছে বলে।"

এই চিঠিতেই বন্ধুদের 'বিবাহ অভিযানের' পথিকৃৎ হিসেবে নিরুপম চট্টোপাধ্যায়কে 'অভিহিত' করেছেন অশোক। জীবন ও জীবিকার আবশ্যিক তাগিদে 'চার ইয়ার' বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও অন্তরের যোগ অটুট ছিল। 'চার ইয়ার' মানে অশোক মিত্র, অরুণকুমার সরকার, নরেশ গুহ এবং নিরুপম চট্টোপাধ্যায়। এককথায় বুদ্ধদেব বসুর চর্তুভুজ। কবিতাভবন-এর আড্ডা যত রাত বাড়ে ততই যেন গভীর হয়। এক সময়, গভীর রাতে, দুশো-দুই নম্বর বাড়ি থেকে বেরিয়ে তাঁরা ঠিক করেন রাসবিহারী অ্যাভিনিউর ট্রামলাইনের সবুজ ঘাসে বসে চাঁদের আলোয় কবিতা পড়বেন। বসে পড়েন। অশোক হয়ত আধশোয়া। মুখস্থ বলে যাচ্ছেন 'ঝরা পালক'-এর কোনও কবিতা। আর একটু হেঁটে গেলেই জীবনানন্দের বাসা। যাবেন সেখানে? না, আজ থাক। ভোর হয়ে এসেছে। দেশপ্রিয় পার্কের পাখিগুলো ডেকে উঠছে। পায়ে হেঁটে তাঁরা চলে এলেন সত্যেন দত্ত রোডের পাঁচ নম্বর বাড়িতে। নরেশ গুহর ভাড়া বাসা। বাইরের ঘরে শুয়ে পড়লেন এলোমেলো। চার জনে।

তবু অশোক ও অরুণকুমারের মধ্যে কীসের অদৃশ্য দেয়াল? দুজনেই দুজনকে যেচে চিঠি লিখবেন না। সে কথা অশোক অকপটে জানান নরেশকে : ''অরুণবাবুও আমাকে চিঠি লেখেন না, আমিও লিখি না। কিছুই হয়নি আমাদের মধ্যে, তবু কী যেন হয়েছে। কোনো-এক দেয়াল, যেটাকে ভেঙে ফেলা যায় না, কারণ সেটার শরীর নেই। অথচ সে-দেয়াল ছায়াশরীরী; ছায়ার বিরুদ্ধে তলোয়ার চালিয়ে লাভ নেই, পরাজয় আমার পক্ষে সুনিশ্চিত, অরুণবাবু চেষ্টা করলে তাঁর পক্ষেও।"

''অশোক মিত্রের অকারণ অবিচল বন্ধুতা আমার জীবনের পরম সম্পদ। ...বামপন্থীরা ক্ষমতায় আসার পরেও অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র মহাশয়ের অনেক রচনায় আমার মতো অর্বাচীন অমার্ক্সিস্টের প্রতি তাঁর সদ্ভাবের উল্লেখ থাকায় মহাকরণের অনেকেই অবাক হতেন এবং বিরক্তি বোধ করেতন।" — লিখেছেন নরেশ গুহ। মৃত্যুর কিছু দিন আগে। ১৯৪৭ থেকে ২০০৮; তাঁদের বন্ধুত্ব অবিচল ছিল। তা যে থাকবেই তার প্রমাণ : প্রথম পরিচয়ের দুবছরেই অশোক মিত্র জানিয়ে দিয়েছেন; ''আপনাকে আমি যে চিঠি উৎসর্গ করে থাকি তা এ-পৃথিবীতে আর কাউকেই করা যেত না।" কেননা, নরেশবাবুর কাছেই তিনি যেন উন্মুক্ত করতে পারতেন নিজেকে। তার নমুনা : ''চিঠি লিখছি আর্মানিটোলা স্কুলকে, আমার শৈশবকে, যে অপরিমিত শান্তি সে-শৈশব পৃথিবীতে ছিল তাকে।...চিঠি লিখছি সেই ক্লাসরুমগুলোকে, বেঞ্চিগুলোকে, বর্ষাদিনে স্কুলের মাঠে জল-জমে-যাওয়াজনিত হদয়ের সেই আনন্দউচ্ছ্বাসকে। চিঠি লিখছি সারল্যকে, পবিত্রতাকে আর নিষ্পাপতাকে।"

যদুবংশীয় এক শিক্ষক

এই দেশে তুলনামূলক সাহিত্য চর্চার পথিকৃৎ বুদ্ধদেব বসু। কিন্তু তাঁর সুযোগ্য শিষ্য নরেশ গুহ না থাকলে এই চর্চা অঙ্কুরে বিনষ্টির উদাহরণ হয়ে থাকত না কি? ছয় দশকে মহীরূহ হয়ে ওঠা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিভাগ, যার সংক্ষিপ্ত অতি-আদুরে নাম তু.সা. বিভাগ, তাঁকে লালন করতে গিয়ে বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশকের উজ্জ্বলতম প্রতিভাবান এই কবির কবিসত্তার অপমৃত্যু ঘটেছে। সারা জীবনে কবিতার বই লিখেছেন মাত্র তিনটি, একটি কবিতা সংগ্রহ, প্রবন্ধের বই দুটি, আছে দুটি ইংরেজি বই। সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারে ও কুমারন আসান পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। এই নীরস তথ্যসমূহ থেকে প্রকটিত হয়ে ওঠে নরেশ গুহর আদর্শ শিক্ষকের স্বরূপটি। আত্মপ্রচার ও আত্মস্বার্থ সযতনে চরিতার্থ করার একটা বিস্ফোরক-যুগে দাঁড়িয়ে কবি ও অধ্যাপক নরেশ গুহকে মনে হবে দূরতম কোনও নক্ষত্রের আলো-মাখা দেবদূত। শতবর্ষ আগে সাড়ে আট দশকের পরমায়ু নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি। আমাদের শেখাতে চেষ্টা করে গিয়েছিলেন মুদ্রিত অক্ষরে নিজের নাম দেখা আর পুরস্কারের শিরোপা সন্ধান করাই সাহিত্যচর্চা নয়। তার পরিসর অনেক বড় এবং মহৎ।

চিঠিগুলির ভবিষ্যৎ

নরেশ গুহকে লেখা বুদ্ধদেব বসুর চিঠির সংখ্যা একশো নব্বই, অমিয় চক্রবর্তীর ছিয়াশি, অশোক মিত্রের তেষট্টি। 'সংরক্ষণযোগ্য পত্রাবলির' এই তালিকা নিজেই তৈরি করেছিলেন পত্রপ্রাপক নরেশ। এই তালিকায় আরও আছেন যামিনী রায়, শিবরাম চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশ, সুকান্ত ভট্টাচার্য, আবু সয়ীদ আইয়ুব, পুলিনবিহারী সেন, অম্লান দত্তের মতো শতাধিক ব্যক্তিত্ব। জীবদ্দশাতে সেগুলি প্রকাশের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। নিজে হাতে সেগুলি সযত্নে পুনর্লিখন করেছিলেন। এছাড়া 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথকে লেখা কবি অমিয় চক্রবর্তীর চিঠি, যার নাম 'কবির চিঠি কবিকে', প্রমথ চৌধুরীকে লেখা অমিয় চক্রবর্তীর চিঠি 'সাহিত্য সারথির সমীপে' গ্রন্থনামে সম্পাদনা করেছিলেন তিনি। বিপুল শ্রমে সম্পাদিত সেই সমস্ত পত্র-পাণ্ডুলিপি এই সময়ের তরুণ প্রজন্মের গবেষকদের পক্ষে হয়ে উঠতে পারে দর্শনীয়, শিক্ষণীয় উপাদান। নরেশ গুহর শতবর্ষে অপ্রকাশিত পত্রাবলি ও ডায়েরির এই আশ্চর্য ভাণ্ডার গ্রন্থাকারে প্রকাশে এগিয়ে আসবেন কেউ?

শুভাশিস চক্রবর্তী : প্রাবন্ধিক ও অহর্নিশ পত্রিকার সম্পাদক।